কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায়: আরকানুল ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ৩. ৪. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন

৪. ৩. ৪. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন

আল-কুরআনুল কারীমের পরিচয় সম্পর্কে এ পুস্তকের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। মানবজাতিকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে আহবানের জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম, যা তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ করেন। পবিত্র কুরআনই আল্লাহর প্রেরিত চূড়ান্ত ও সর্বশেষ গ্রন্থ। কুরআন কারীমে মানবজাতির সকল কল্যাণ, সকল মঙ্গল ও সকল সফলতার উৎস। আল্লাহর এই সর্বশেষ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পূর্বের গ্রন্থগুলিকে দেননি। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে কুরআন করীমের এ সকল বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করব:

৪. ৩. ৪. ১. অলৌকিকত্ব

কুরআন কারীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অলৌকিকত্ব। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহ অনেক ‘আয়াত’ বা মুজিযা প্রদান করেছেন। সেগুলি ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। তাঁদের সমসাময়িক মানুষেরা সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে পরবর্তী মানুষেরা আর তা প্রত্যক্ষ করেননি। কেবল বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মহান আল্লাহ অন্যান্য অগণিত আয়াত বা মুজিযার পাশাপাশি ‘চিরন্তন’ মুজিযা হিসেবে আল-কুরআন প্রদান করেন। যার অলৌকিকত্ব যেমন তাঁর সমকালীন মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন, তেমনি পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا مِنْ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أُعْطِيَ مِنْ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘‘নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীই এমন আয়াত বা মুজিযা প্রাপ্ত হয়েছেন যে মুজিযার পরিমাণে মানুষেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে ‘আয়াত’ বা মুজিযা প্রদান করা হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, এজন্য আমি আশা করি যে, নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।’’[1]

বস্তুত, কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করেছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যাদির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ। এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করবে। কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলোকিত করবেন। কেউ তা জেনেও অবহেলা করবেন বা এড়িয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করবেন।

কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ।

মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা। কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীম শুধু ধর্মগুরুদের জন্য ‘নিয়ম পুস্তক’ নয়, বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রত্যেক মানুষের পাঠের, শ্রবণের ও অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থ। এজন্য কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে অর্থ, ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। আর এই অপার্থিব ও অলৌকিক ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থের আবহের সর্বোচ মান রক্ষিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল স্থানে একইভাবে। এটিই কুরআন কারীমের একমাত্র অলৌকিকত্ব নয়, তবে তার অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক।

আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। তারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় ও সহিত্যের মূল্যায়নে ছিলেন অতি পারঙ্গম। মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি-সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন কুরআনের যে কোনো একটি ছোট সূরার সমপরিমাণ সূরা কুরআনের সাহিত্যমানে রচনা করার জন্য।’’

মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

‘‘আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার- আর কখনোই তা করতে তোমরা পারবে না- তবে সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।’’[2]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

‘‘তারা কি বলে, ‘সে তা রচনা করেছে?’ বল: ‘তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’’[3]

তিনি আরো ঘোষণা করছেন:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

‘‘বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।’’[4]

কাফিরগণ মুহাম্মাদ (ﷺ)–কে প্রতিহত করতে তাদের জান-মাল কুরবানী করেছে, কিন্তু এই সহজ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি। কুরআনের যাদুকরী আকর্ষণীতায় অবাক হয়ে কখনো তারা একে ‘যাদু’ বলে অভিহিত করেছে।[5] কখনো বলেছে, এগুলি পূর্ববর্তী যুগের গল্প-কাহিনী[6] এবং বানোয়াট কথা মুহাম্মাদ (ﷺ) তা বানিয়েছেন[7]। কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথীদেরকে বলেছে: ‘‘তোমরা এই কুরআন শ্রবণ

করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।’’[৪]

এগুলি সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ। কিন্তু কখনোই এর মুকাবিলায় একটি ছোট্ট সূরা তারা উপস্থাপন করে নি। আর একথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর স্বভাব-কবি আরবগণ যাদের জাহিলী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট জাত্যাভিমান, প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভুতি সুপ্রসিদ্ধ, তারা জন্মভূমি পরিত্যাগ, রক্তপাত, জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল, তাদের সন্তানসন্তি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দী হলো, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো। অথচ এই সহজ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করল না।

নুবুওয়াতের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট্ট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যাণ করবে। এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল।

আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয় নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

৪. ৩. ৪. ২. সংরক্ষণ

কুরআন কারীমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক এর সংরক্ষণ। মহান আল্লাহ কুরআনকে অবিকল ও আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন।

আমরা জেনেছি যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলি বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে। যেহেতু মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে আল্লাহ পরবর্তী সকল যুগের মানুষদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন, তাই তিনি নিজে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে পবিত্র কুরআন সকল পবিবর্তন, পরিবর্ধন কোনো অংশের বিলুপ্তি বা বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত থেকেছে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

‘‘নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চিতরূপেই আমি তাঁর সংরক্ষক।’’[৭]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“এটি অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো অসত্য এতে অনুপ্রবেশ করে না বা করবে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও নয়। প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে তা অবতীর্ণ।”[10]

বর্তমানে বিদ্যমান বিকৃত তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ইত্যাদির ভাব, ভাষা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, এগুলি প্রথমত কতিপয় ধর্মগুরুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় এগুলির স্থান ছিল না। উপরন্তু সাধারণ মানুষদেরকে এগুলি পাঠ করতে নিষেধ করা হতো। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে সামান্য কিছু অংশ পাঠ ছাড়া সাধারণ মানুষ এসকল পুস্তকের কোনো খোঁজ রাখতো না। এছাড়া এগুলির ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরক্তিকর বর্ণনা, যা কোনোভাবেই মুখস্থ রাখা যায় না। এ সকল কারণে এগুলির বিকৃতি ও বিলুপ্তি সহজ হয়।

কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক যে, মহান আল্লাহ একে মুসলিম উম্মাহর সকলের জন্য পাঠ্য করে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এবং রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন পাঠ ও কুরআন ‘খতম’ করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিয়মিত পাঠ করাকে মহান আল্লাহ মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছে তারা যথাযথভাবে তা আবৃত্তি করে তারাই এতে ঈমান আনে। আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।”[11]

কুরআন কারীমের অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক। এর অপূর্ব ভাষাশৈলী ও অপার্থিব অর্থ-আবহ যে কোনো মুমিনকে তা পাঠ করতে আগ্রহী করে তোলে। সর্বোপরি অলৌকিক ভাষাশৈলীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা অলৌকিকভাবে সহজ করেছেন। আমরা জানি যে, নিজের মাতৃভাষার রচিত ১০০ পৃষ্ঠার একটি সাহিত্যকর্ম হুবহু আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখা যে কোনো মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব বিষয়। অথচ ১০/১২ বৎসরের একজন অনারব কিশোরও কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখতে সক্ষম। এই অলৌকক বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহাবীগণের যুগ থেকেই অগণিত ধার্মিক মুসলিম কুরআন কারীম পরিপূর্ণ মুখস্থ করেছেন। তাঁরা রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন খতম করতেন। এছাড়া দিবাভাগে নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা খতম করতেন।

একারণে কুরআন যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)_এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, অবিকল সেভাবেই মুখস্থ করেছেন, সালাতের মধ্যে পাঠ করেছেন ও নিয়মিত খতম করেছেন সাহাবীগণ এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মানুষেরা সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতির কোনো সুযোগই ছিল না।

এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মুখস্থ করার পাশাপাশি কুরআন কারীম লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন।

বস্তুত: কুরআন কারীমে উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থ তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল, বা বাইবেলের বিকৃতি সম্পর্কে যেমন আধুনিক খ্রিষ্টান ও ইহুদী গবেষকগণ একমত, তেমনিভাবে কুরআন কারীমের অবিকৃতিও অমুসলিম গবেষকরাও

মেনে নিয়েছেন। যারা কুরআনকে আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন না, বরং মুহাম্মদ (ﷺ)– এর রচনা বলে মনে করেন, তারাও স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ)–এর সময়ের তাঁর প্রচারিত কুরআনই এখন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। কারণ, সাহাবীদের সময় থেকে নিয়ে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের কুরআন কারীমের হাতে লেখা অনেক পান্ডুলিপি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পাঠাগারে বা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে, সে সকল পান্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সময় থেকে এখন পর্যন্ত কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রয়েছে।[12]

৪. ৩. ৪. ৩. সার্বজনীননতা

আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ অবতরণ করেছেন তাতে একদিকে একমাত্র বিশুদ্ধ বিশ্বাস, আল্লাহর ইবাদত, ভাল ও মন্দ কর্মের ফলাফল, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, সৃষ্টির কল্যাণ, অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ও সত্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। অপর দিকে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাগতিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক বিধান, সমাধান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো মূলত সার্বজনীন। বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একই প্রকৃতির। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো যুগ ও সময়ের পরিবর্তনে কিছু পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্নযুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নমুখি সামাজিক ও জাগতিক সমস্যা থাকতে পারে এবং এ সকলের সমাধানও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরকম হতে পারে। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো সম্পর্কে সকল আসমানী কিতাবের বর্ণনা ও শিক্ষা একই ধরনের। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুসারে করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের পূর্বে আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ মানবজাতিকে প্রদান করেছেন তা ছিল নির্দিষ্ট কোনো জাতি ও নির্দিষ্ট একটি সময়কালের জন্য। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা ও ব্যাখ্যায় তৎকালীন জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমাজের সমস্যা ও তাদের উপযোগী সমাধানই দেওয়া হয়েছে।

মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর পূর্বে কোনো নবী-রাসূল তাঁর ধর্মের বা তাঁর কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেননি। উপরন্তু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য মানুষদের কাছে তাঁর ধর্ম বা কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। এজন্য অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন না।

খৃস্টানগণ তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন। অথচ তাদের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেলে 'যীশু' বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবলমাত্র 'ইস্রায়েল-সন্তানগণের' জন্য প্রেরিত হয়েছেন। ইস্রায়েল সন্তানগণ ছাড়া অন্যদের নিকট তাঁর ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। বিকৃত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু খ্রীস্ট যখন তাঁর ১২ জন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করে ধর্ম প্রচারে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, ''তোমরা পরজাতিগণের (অ-ইহূদীদের) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ করিও না...''[13] তিনি আরো বলেছেন: ''ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।''[14]

এভাবে তিনি অ-ইহূদী সকল জাতি ও শমরীয়দের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করলেন। এবং তাঁর ধর্মকে শুধুমাত্র ইস্রায়েল সন্তান বা ইহূদীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করলেন। প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম ও দীক্ষা প্রদান তো দূরের কথা, অ-ইস্রায়েলীয় বা অ-ইহূদীদেরকে যীশু সামন্য দু'আ করতে বা ঝাড়-ফুঁক দিতেও রাজি হন নি। বরং তাদেরক কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[15]

পক্ষান্তরে কুরআন কারীম সর্বদা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়ত ও কুরআনের নির্দেশনা ‘মানব জাতি’র জন্য বলে উল্লেখ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বজনীনতা বিষয়ক আয়াতগুলি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অন্যত্র মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনকে তিনি মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

“রামাদান মাস, যাতে মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।”[16]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“এটি এমন একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে নিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।”[17]

এজন্য কুরআন কারীমে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো, অর্থাৎ সঠিক বিশ্বাস (সহীহ আকীদা), নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি, সৎ ও অসৎ কর্মের বিবরণ ও পরিণতি বর্ণনায় এমন এক পরিপূর্ণ স্পষ্টতার অনুসরণ করা হয়েছে যেন, সকল যুগে সকল সমাজের মানুষই সাধারণ ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমেই এর শিক্ষা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অপর দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো, অর্থাৎ সামাজিক, জাগতিক বা বৈষয়িক সমস্যাসমূহের সঠিক ও কল্যাণমুখী সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপভাবে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে যেন সকল যুগের সকল সমাজের মানুষেরা এর অনুসরণ করতে পারে, আবার বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজের চাহিদা, মূল্যবোধ, ও নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। আর এসব কিছুই সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সহজ ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

“নিশ্চয় আমি কুরআনকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, শিক্ষা গ্রহণের জন্য কি কেউ আছে?”[18]

৪. ৩. ৪. ৪. পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের রহিতকরণ

কুরআন অবতারণের মাধ্যমে আল্লাহর পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল শিক্ষাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহাগ্রন্থের পূর্বের সকল গ্রন্থকে রহিত করেছে। তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল বিষয়ক আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল বিশুদ্ধ শিক্ষাগুলির সমর্থক ও নিশ্চিতকারী, সেগুলির পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক। কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই কিতাবীদের মনগড়া বিষয়, কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির অনুসরণ করা যাবে না। এজন্য মহান আল্লাহ কুরআন করীমকে পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirmer) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (watcher) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. ৩. ৪. ৫. মুক্তির একমাত্র দিশারী

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনই আল্লাহর একমাত্র অবিকৃত ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত বাণী, যাকে আল্লাহ সকল যুগের সকল মানুষের মুক্তির জন্য সত্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের দিশারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

এর অনুসরণই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। কল্যাণ, বরকত, সফলতা ও মুক্তির সন্ধান দিয়ে মানুষকে তার কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছাতে পারবে একমাত্র এই গ্রন্থই। আল্লাহ এই মহা গ্রন্থকে প্রেরণ করেছেন তা অনুধাবন করার জন্য এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনার জন্য।

আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

‘‘হে মানব জাতি, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা রয়েছে তার প্রতিকার এবং সঠিক পথের পথনির্দেশ ও রহমত মুমিনদের জন্য।’’[19]

এই গ্রন্থের অনুসরণই মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ ও রহমত পথে পরিচালিত করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘‘আমি এই কিতাব নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবাধান হও, তাহলে হয়ত তোমরা রহমত পেতে পারবে।’’[20]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

‘‘নিশ্চয় এই কুরআন পথ নির্দেশ করে সর্বোত্তম বিষয়ের এবং সুসংবাদ প্রদান করে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে যে, তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।’’[21]

আমরা দেখেছি যে, কুরআনকে আল্লাহ নাযিল করেছেন সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায়, যেন সকল পাঠক সহজেই তা বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তার শিক্ষা অনুসরণ করতে পারে। কুরআনের অর্থ চিন্তা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

‘‘তারা কি কুরআনকে অনুধাবণ করে না? না কি তাদের অন্তর তালাবন্ধ?’’[22]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ

‘‘এটি এক মহাকল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণা করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।’’[23]

এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব কুরআন পাঠ করা ও অনুধাবন করা। সম্ভব হলে একটু কষ্ট করে কুরআন বুঝার মত সহজ আরবী শিক্ষা করা। না হলে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা। প্রত্যেকেরই দায়িত্ব কুরআন দিয়ে হৃদয় আলোড়িত ও আলেকিত করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর শিক্ষার অনুসরণ করা।

এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই নূর বা আলো যা মানব জাতিকে সত্য, কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। যার অনুসরণের মাধ্যমেই সফলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন:

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“অতএব তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর এবং যে নূর (আলো বা জ্যোতি) আমি নাযিল করেছি তার (কুরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।”[24]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“যারা তাঁর (রাসূল উম্মী নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।”[25]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

“হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি।”[26]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

“এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি আমার নির্দেশের রূহ, তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী, পক্ষান্তরে আমি একে করেছি নূর, যদ্বারা আমি আমার বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ।”[27]

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“আমি এই কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথে।”[28]

আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা ও তাঁর নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করা বিশ্বাসীদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহর গ্রন্থের কিছু অংশকে বিশ্বাস করা আর কিছুঅংশকে অবিশ্বাস করার অর্থ একে পুরোপুরি অবিশ্বাস করা। তেমনিভাবে এর শিক্ষা ও বিধানমত জীবণ পরিচালনা না করা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, অত্যাচার ও কঠিন পাপ। মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অবিশ্বাসী।”[29]

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অত্যাচারী।”[30]

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো পাপী।”[31]

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরূপ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্চনা এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।”[32]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম অংশ। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম আল্লাহর প্রেরিত সকল গ্রন্থে বিশ্বাস করেন। কুরআন কারীমের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আমাদের বিশ্বাস মৌলিক সত্যতায় বিশ্বাস ও সম্মান দানে সীমাবদ্ধ, আর কুরআনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কর্মময়। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে-যুগে যত গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন সবই সত্য এবং সবই আল্লাহ বাণী। তবে যেহেতু পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে, তাই সেসকল গ্রন্থের অনুসরণ বা তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা সম্ভব নয়। কুরআন কারীমকে আল্লাহ সর্বশেষ গ্রন্থ হিসেবে সর্বকালের সকল মানুষের জন্য অবতারিত করেছেন এবং তাঁর বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করেছেন। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর একমাত্র সংরক্ষিত বিশুদ্ধ বাণী বলে বিশ্বাস করেন এবং এর শিক্ষা অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন।

ফুটনোট

[1] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৯০৫, ৬/২৬৫৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৩৪।
[2] সূরা: ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।
[3] সূরা : ১০ ইউনূস, ৩৮ আয়াত।
[4] সূরা: ১৭ ইসরা (বানী ইসরাঈল), ৮৮ আয়াত।
[5] নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা আনআম: ৭, ইউনূস: ২, হূদ: ৭, হিজর: ১৫, ইসরা: ৪৭, আনবিয়া: ৩, ফুরকান: ৮, সাবা: ৪৩, সাফফাত: ১৫, সাদ: ৪, যুখরুফ: ৩০, আহকাফ: ৭, কামার: ২, মুদ্দাস্‌সির: ২৪ আয়াত।
[6] দেখুন: সূরা আনআম: ২৫, আনফাল: ৩১, নাহল: ২৪, মুমিনূন: ৮৩, ফুরকান: ৫, নামল: ৬৮, আহকাফ: ১৭, কালাম: ১৫, মুতাফ্ফিফীন: ১৩ আয়াত।

[7] নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা ফুরকান; ৪, সাবা: ৪৩, আহকাফ ১১ আয়াত।
[8] সূরা : ৪১ ফুসসিলাত (হা-মীম-আস্সাজদা): ২৬ আয়াত।
[9] সূরা ১৫ হিজর: ৯ আয়াত।
[10] সূরা ৪১ ফুসসিলাত/হামিম সাজদা: ৪১-৪২ আয়াত।
[11] সূরা (২) বাকারা: ১২১ আয়াত।
[12] বিস্তারিত দেখুন: The New Encyclopedia Britannica (knowledge in depth) 15th edition Vol 2 pp 879-977 (Biblical literature), Vol 4 pp 459-545: Christianity, Vol 10 pp 145-155: Jesus Christ , Encyclopedia of Religion and Ethics ,Edition by James Hestings, New York. Vol 2 pp 532-615: Vol 3 pp 579-600 : Vol 7 pp 439-550: Israel, Jesus Christ, Historia Religionum Edited by C. Jouso Bleeker and Geo Widengren Vol 1 pp 237-317.
[13] মথি : ১০/৬।
[14] মথি : ১৫/২৪।
[15] মথি: ১৫/২২-২৬।
[16] সূরা (২) বাকারা: ১৮৫ আয়াত।
[17] সূরা (১৪) ইব্রাহিম :১ আয়াত।
[18] সূরা (৫৪) ক্বামার: ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ আয়াত।
[19] সূরা ইউনূস: ৫৭ আয়াত।
[20] সূরা আনয়াম: ১৫৫ আয়াত।
[21] সূরা বানী ইসরাঈল (ইসরা): ৯ আয়াত।
[22] সূরা মুহম্মদ: ২৪ আয়াত।
[23] সূরা (৩৮) সা'দ: ২৯ আয়াত।
[24] সূরা (৬৪) তাগাবুন: ৮ আয়াত।
[25] (সূরা (৭) আ'রাফ: ১৫৭ আয়াত
[26] সূরা (৪) নিসা: ১৭৪ আয়াত।
[27] সূরা (৪২) শূরা: ৫২ আয়াত।
[28] সূরা ইব্রাহীম: ১ আয়াত।
[29] সূরা (৫) মায়িদা: ৪৪ আয়াত।
[30] সূরা (৫) মায়িদা: ৪৫ আয়াত।
[31] সূরা (৫) মায়িদা: ৪৭ আয়াত।
[32] সূরা (২) বাকারা : ৮৫ আয়াত।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13655

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন